আজকে যাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন

রমেন রায়

বাংলার শিশু সাহিত্যে সুনির্মল বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। একথা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন। তাঁর রচনা শুধু যে শিশুদেরই আকৃষ্ট করতো এমন নয়, বড়দেরও সমান আনন্দ দেয়। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর বহু রচনা কোথায় হারিয়ে গেছে--তা আজ খুঁজে পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। অজস্র কাগজে তিনি লিখেছেন। অজস্র প্রকাশনী থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে সব লেখা আর প্রকাশনীর হদিস পাওয়া আজ আর সম্ভব নয়। তাই তাঁর জন্মশত বছরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হয়তো কিছু খামতিই থেকে যায়।.....

কথায় বলে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর এক আসনে ঠাঁই হয় না। অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী বিরাজ করেন সেখানে নাকি লক্ষ্মীদেবী থাকেন না। কথাটা প্রচলিত কথা হলেও কার কার জীবনে দেখা যায় সত্যি সত্যি যাঁরা সরস্বতীর আরাধনায় মগ্ন থাকেন লক্ষ্মীদেবী তাঁদের চৌহদ্দিতে থাকেন না। শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুও ছিলেন এমনি একজন মানুষ। তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সারস্বত আরাধানায় শিশু-কিশোর সাহিত্যে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু জীবনে কখনও অর্থের প্রাচুর্যের মুখ তিনি দেখেন নি।

অভাব-অনটনের, দৈন্যের মধ্যে থেকেও কবির সাহিত্য সাধনায় কোন ছেদ পড়ে নি। ব্যক্তিগত জীবন ও তার কোন ছাপ তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলে অনুমিতি হয় না। কোন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা না করে, কোন প্রতিদানের আশা না করে তিনি উপহার দিয়ে গেছেন বাংলার শিশু কিশোরদের তার সাহিত্য। পৃথিবীর সমস্ত শিশুর সুখের জন্য অনাবিল আনন্দের জন্য, তাদের সব দুঃখ কষ্ট-নিজের জীবনে গ্রহণ করে নিতেই তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। বেদনাটাই যেন কবির বিলাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দুঃখের মধ্যেই অন্বেষণ করেছেন সুখের। তাই সামাজিক দুঃখ কষ্টকে আমল না দিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিশুদের সাথে আনন্দের হাটে যেন নৃত্য করে গেছেন; বলা যায় আপ্লুত করেছেন তাদের হৃদয়, কাল হতে কালান্তরে।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ , নির্লোভী আর নিরহঙ্কারী। মনে প্রাণে খাঁটি বাংলার কৃষ্টি যেন তাঁর দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হত; ধুতি পাঞ্জাবী আর কাঁধে চাদর-এই ছিল তাঁর পোষাক।

আজ তাঁর প্রতি "শতবর্ষের শ্রদ্ধা" জানাতে গিয়ে মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলার কত মজার গল্প বা ছড়ার কথা যা সুনির্মল বসুর লেখা। সে সব হাসির রসে ভেজান রসালো কথা যা পড়ে আমরা কেমন মেতে উঠতাম। ছন্দ তালের কি অপূর্ব বৈভব। ছন্দের রিন রিন শব্দ কি ভোলা যায়। সে সব শব্দ যেন আজও কানে বাজে। তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি যেমন--

(১) "হাবরা মাঠে কুস্তি হবে,
গোবরা এবং গামার
দেখবে সেটা ইচ্ছে হল,
নন্দলালের মামার।"

(২) ‘‘ঠকিস নাকো দেখিস ব্যাটা,
দোকান দার সে বেজায় ঠ্যাঁটা
আয় নিয়ে আয় বাজার ঘুরি
আধ পয়সার প্যাঁজ ফুলরি।’’
শুধু এই নয়। তিনি ছন্দ নিয়েও নানা খেলা করেছেন। নানান ছন্দে, তালেও তিনি কবিতা লিখেছেন। যেমন দেখুন--
(৩) ‘‘চলে গোর গাড়ি
দূরে তর সার
গাড়োয়ান গুণ গুণ গায়.....’’
আবার একসময় ছেলে-বেলায় তার কেটেছে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে। তাই দেখি তাঁর সাঁওতালি গানের অনুকরণে এবং সেই গানের ছন্দে তাঁর কবিতা--
(৪) ‘‘এল ঝড় বাদল ধর মাদল গান বাজা
ধর তান বাঁশির গ্রামবাসীর পণ তাজা।’’
(৫) ‘‘জংলা দেশের ঠিক কি বল
মাংলা ভায়া জলদি চল--’’
তিনি তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধে একজায়গায় লিখেছেন--
(৬) ‘‘আমার কবিতা প্রসাদীর ফুল
ঝরে পড়ে পলে পলে--
আমার কবিতা ধন্য যে হয়
মায়ের চরণ তলে।’’
তাঁর রূপ কথার গল্প, পড়তে পড়তে কখন যে গল্পের মধ্যে হারিয়ে যেতাম অচিন দেশে তা নিজেরাই টের পেতাম না। শুধু কি তাই! তার মজার লেখনীর মধ্যে দেখেছি কত কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান। পেয়েছি নিষ্ঠার শিক্ষা। তিনি আমাদের মেকি সামাজিক সম্পর্কগুলো নিয়ে সরস কৌতুকে মুড়ে ‘‘মুখে আর মনে’’ কবিতায় শুনিয়েছেন সেই কতকাল আগেই। কবি আর শিল্পীরা তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাই হন। তারা আগাম দেখতে পান যা ঘটবে তার চিত্ররূপ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কথা বলছি। তখন ‘‘সন্দেশ’’ পত্রিকা ছোটদের কাছে, কিশোরদের কাছে একটা দাণ ব্যাপার ছিল। এই সন্দেশেই ষষ্ঠ বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় সুনির্মল বসুর প্রথম লেখা ছেপে বেরোয়।

গল্পের নাম ‘‘মুন্সিজী’’। ক্রমাগত সন্দেশে তাঁর লেখা একের পর এক ছেপে বেতে লাগলো। বলা যায় এই সন্দেশ পত্রিকাই সুনির্মল বসুকে সাহিত্যিক হিসেবে সকলের কাছে চিনিয়ে দিল।

তিনি যে শুধু লিখতেই পারতেন এমন নয়। তিনি সঙ্গে মজার মজার সুন্দর ছবিও আঁকতে পারতেন। তাঁর লেখায় তিনি নিজেই মজার ছবি এঁকে দিতেন। তিনি যেমন নাটক করত পারতেন তেমনি গানও করতে পারতেন।
জন্মে ছিলেন বিহারের গিরিডিতে। ছেলেবেলা এবং কৈশোর গিরিডিতেই কাটে। পড়াশুনোও সেখানেই, পরবর্তী কালে তিনি কলকাতায় সেন্টপলস কলেজে পড়াশুনা করেছেন। ‘‘ওরিয়েন্টাল আর্ট অফ্ স্কুল’’ --যেটা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে চিত্রকলার শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালেও ‘‘পাতার ভেঁপু’’ প্রভৃতি বইয়ের প্রচুর ছবি এঁকেছেন। কিন্তু চোখে কষ্ট অনুভব করতেন বলে পরে আঁকার কাজটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।
জীবনের প্রথম দিকে তিনি গিরিডিতেই স্কুল মাষ্টারি করেছেন। এই স্কুল মাষ্টারির সুবাদে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্ত মহালানবিশ, শ্রীঅমল হোমের মত ছাত্রদের পেয়েছিলেন।

বহুযুগ আগে থেকেই আমাদের দেশে রূপকথা এবং ছড়া প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তবে ওসব রূপকথা আর ছড়াগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ওগুলোর কোন সাহিত্য মূল্য ছিল না। অর্থাৎ সাহিত্য বলেই বিবেচিত হোত না। উনবিংশ শতাব্দী এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বেশীর ভাগ শিশু সাহিত্যিকরা এ সমস্ত রূপকথা, ছড়া বা কবিতায় বা গল্পে রূপ দিয়ে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন ঠিকই কিন্তু মুশকিলটা হোল যে, ওই সমস্ত রচনা কালোপযোগী হয়ে ওঠে নি। কারণ সেগুলোর সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক ছিল খুবই কম। অনেক গল্পে দেখা যায় যে, অলৌকিক ঘটনার উপাদান এত বেশী রয়েছে যে ওগুলো শিশু চিত্তকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। যার ফলে সেসব লেখা আজকের শিশু-সাহিত্যের পরিপন্থী বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু সুনির্মল বসুর কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে এই সুনির্মল বসুই হলেন প্রথম পুষ যিনি তাঁর লেখায় এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ ছিলেন।

ইতিপূর্বে অর্থাৎ সুনির্মল বসুর পূর্বে অনেকেই শিশুমনকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জন্য নানা রকম ভক্তি বিষয়ক গল্প লিখতেন। কিন্তু এব্যাপারে অনেকেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ প্রস্তাবনা ঠিক ঠিক না হওয়ার কারণে অনেকে পরোক্ষে ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ করে তুলেছেন। কিন্তু সুনির্মল বসুর লেখার বিদ্ধে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় না। তাঁর সাহিত্য কর্ম জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে যেকোন শিশুরই সুখপাঠ্য। তাঁর সাহিত্য কর্মে সার্বজনীন একটা অনুভূতি বিরাজমান। লেখার ভাষা যে কত সহজ, সরল আর সবল হতে পারে কত গভীর ভাবও যে কত সহজভাবে পরিবেশিত হতে পারে তা তিনি তাঁর লেখনীতেই দেখিয়ে গেছেন। তাঁর সাহিত্যের ব্যাপ্তি সর্বস্তরের শিশুদের জন্য। যে পড়তে শেখেনি, শুধু শুনে শুনে কল্পনার জাল বোনে, সে বয়স থেকে আরম্ভ করে, যে মন ঝোপের ধারে লুকিয়ে থেকে অতর্কিতে কাকে আক্রমণ করে লড়াইয়ের উত্তেজনা অনুভব করে, অর্থাৎ শিশু মন যখন অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে ওঠে, সেসব বয়সীদের কাছেও সুনির্মল বসু সমান প্রিয়। শিশুদের চরিত্র গঠন ও মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর সাধনা।

দ্বিযুদ্ধের আগে যখন কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী--তখনও তেমনভাবে প্রচলিত হয় নি, সেই তখন, অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে ‘‘অসম্ভবের দুনিয়া’’ লিখে ছেলেমেয়েদের কাছে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন। তিনি যদি রাশিয়া অথবা ইউরোপের যে কোন দেশে জন্মাতেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে ‘‘ভুবনেশ্বরী’’ পুরস্কার আর মারা যাওয়ার পর মরণোত্তর ‘বিদ্যাসাগর’ পুরস্কার ছাড়া তাঁর ভাগ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য আর কোন পুরস্কার এসেছে বলে জানা নেই।

দেশের শ্রেষ্ঠ কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে এমন মানুষটির শতবর্ষে পদার্পণের ঘটনা আমাদের সাহিত্যিকদের অন্তর আন্দোলিত করে, মনকে পুলকিত করে।

পরিশেষে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু জন্মশত বর্ষ পালনে কিংবা একদিনের শতবার্ষিকী স্মরণ সভায় অথবা শুধুই স্মরণিকা প্রকাশেই যেন সুনির্মল বসুর সাহিত্য কর্মের মূল্যায়ন শেষ না হয়ে যায়। তাঁর সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারই কাম্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com